প্রকাশক
সুধাংশু ঘোষ
১০, আর জি কর রোড
কলিকাতা

পরিবেশক
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
শ্রীনীরদ চৌধুরী
প্রকাশিকা লিঃ (নববিধান প্রেস)
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৯

মা বাবা ও
চিনিদি কে

সূচীপত্র

তুমি আমার বাঙলা

তুমি আমার শ্যামা বঙ্গভূমি
তুমি আমার সমুদ্রকন্যা সাগরিকা মেয়ে
তুমি আমার হৃদয়ে অস্থির কল্লোল।

তুমি আমার বাঙলা।
যে মেঘনার তীর থেকে আমি মেদুর স্বপ্ন নিয়ে এলাম
সে মেঘনা তোমার উদার দিগন্তকে স্পর্শ করেছে ;
যে মেঘনা সন্ধ্যায় সুবর্ণরেখা ;
যার দুই তীরে বেলাশেষের নারিকেল বীথি
আলোর পতাকা তোলে।
— খেয়াঘাটে যাত্রী বাড়ে,
একে একে জড়ো হয় ঘরফেরা নৌকো ;
যে মেঘনার পাশে বসে মৃদু অন্ধকারে
বোবা বুকে হঠাৎ স্রোত জেগে ওঠে,
সে মেঘনা তোমার হৃদয়।

বাঙলা, তোমার মধ্যাহ্নের মগ্নভূমি থেকে
বহুদূর হেঁটে এলাম।
তোমার প্রান্তরে হলুদ রৌদ্র,
তোমার মাঠভাঙা পথে ক্লান্ত পথিক,
তোমার দিকে দিগন্তরে কেবল শান্তি।
তোমার সেই শান্তিকে আমি

তুমি আমার বাঙলা

আমার শ্যামল মাটির আঙিনায়
বিছিয়ে দিয়েছি।
বাঙলা, তোমার শহরগঞ্জগ্রামে কত মাকে
দেখে এলাম বেদনার তীর্থবাসী,
কত বোনকে দেখে এলাম
দুঃখের বহ্নিতপ্ত তপস্যা থেকে
অনন্ত হৃদয় বিস্তার করেছে,
কত ভাই ধানের নতুন চারার মত
হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠে
মৃত্যুর দিকে চলে গেল। বলে গেল,
'আমার এপ্রাণকে তোমরা গ্রহণ করো।'

তোমার কুমারকে দেখে এলাম সন্ধ্যায়
মেঘনার স্রোতের কাছে বসে আছে
হৃদয়ে কল্লোল ডেকে নিতে॥

বাঙলা, রোজ ভোরে তোমার প্রসন্নমুখ
মনে মনে আঁকি। অসহ্য উত্তাপ দিয়ে
যে মুখ গড়েছি এতোকাল;
যে মুখ সন্ধ্যার উৎসের কাছে উন্নত,
যে মুখ রাত্রির নদীর মত নির্জন।

তবু সে মুখ মুছে যায়
যখন মৃত্যুর কান্না নিয়ে পথে পথে রাত্রি হাঁটে;
যখন দলে দলে লোক ঘর ছাড়ে মাতাশিশুকন্যা,

তুমি আমার বাঙলা

ভীরু শঙ্কায় মাঠের কন্যা সীতাকে
রেখে আসে মাঠে, পৌষের সাধ
হারিয়ে আসে অন্ধকারে।
গুলিবিদ্ধ কাকদ্বীপ সমুদ্রের কাছে
বেদনার রক্ত ঢালে,
অন্ধকার প্রদীপ হাতে নিয়ে
অস্থির জলের মত দিগন্ত থেকে দিগন্তে
মানুষ দীপ্তি খোঁজে। দিকে দিকে সফেন নাগিনী জাগে ;
দিকে দিকে লোভ, ষড়যন্ত্র, হত্যা ;
কালো মেঘের মত বর্গী নামে
গ্রামের রৌদ্রকরোজ্জ্বল মাঠকে কালো করে দিয়ে।
সন্ধ্যা না হতেই খেয়াঘাটের উজ্জ্বল দাঁড়
থেমে আসে। ঘরে ফেরে লোক।
নৌকোর বাতি দীর্ঘ রেখা টানে
নদীর নির্জন জলে। রাত্রি কথা কয় না।
মাঠের নিঃশ্বাস বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়।

তখন তোমার মুখে দুঃসহ ঘৃণা জাগে
তখন তোমার চোখ দীপ্তবহ্নিচূড়া।

আর তোমার কুমার ঘরে ঘরে দেয়ালে দেয়ালে
রক্ত দিয়ে জীবনের নাম লেখে।।

আমি আবার তোমার মুখ আঁকি।
তীব্রলাল রঙ দিয়ে দীঘল চোখ আঁকি

তোমার শ্যামলসুন্দর মুখে।
নিদারুণ ভ্রূসন্ধিতে তোমার অপূর্ব ঘৃণাকে আঁকি

সে মুখ আমার মনে বিদীর্ণ ভোর।
সে মুখ আমার মনে অশ্রুর সঞ্চয়॥

দুঃসহ স্বপ্নের কথা

আর কতকাল রাত্রিকে রচনা করি
নক্ষত্রের মত, আকাশ রচনা করি
অস্ফুট ভোরের, কতকাল বৈশাখের দীর্ণ পত্রপুটে
আষাঢ়ের যৌবন ধরে রাখি। এঅন্ধ জীবনের
অপরূপ কামনার শেষ নেই।

কামনাকে প্রশ্ন করি, 'আমাকে কোথায় তুমি
নিয়ে যেতে পার, কত দূরে ? মৃত্যুজয়ী
দেশে দেশে, হিংসায় বিদ্বেষে লোভে
মানুষ কুৎসিত হল, দগ্ধমুখ সন্ধ্যার প্রতিমা।
আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে,
কী দেবে আমাকে ?'

সুতীক্ষ্ণ কুঠার দিল হাতে :

প্রশ্ন করি, 'আমি অন্ধ অস্থির জীবন ;
অরণ্যের অন্ধকারে আলোকের
উৎকণ্ঠা আমার। কী দেবে আমাকে তুমি ?
আমি রাত্রি। দিনের দিগন্তের দিকে
যাত্রা আমার। আমাকে আগ্নেয় কর,
ললাট বিদীর্ণ করে দৃষ্টি দিয়ে যাও।'

প্রান্তরে বিষণ্ণ মৃত্যুর কাছে
নিয়ে গেল। শিশুর সুন্দর মুখে

করালকঠিন মাটি, অঙ্গে তার
সহস্র লোভের শিকড়।—বলল,
'মৃত্যু নয়, পৃথিবীর দুঃসহ স্বপ্নের ভার
তোমাকে দিলাম ॥'

সময়

এবার ধনুক
তুলে ধরো, সময় হল গানের, সময়
হল, ধানের
সময় হল ॥

বহু দখিন হাওয়ার আশায়
দিন তো গেছে, মেঘের ছায়া
ছড়িয়ে মাঠে বৃষ্টি
ঝরঝর, ভেবে,
দিন তো গেছে। আকাশ হঠাৎ
আশ্বিনে নীল
মুখরময়ূর হবে, ঘরের কোণে ক্লান্ত ঘুঘু ডাকে
ত্নপুর ভরে দেবে, বলে
দিন তো গেছে।

এবার ধনুক
তুলে ধরো, সময় হল
গানের, সময়
হল ॥

স্বর্ণশিখার প্রাণমঞ্জরী
এবার ঘরে তোল, এ অঘ্রানে
দীপ্তমনে যাত্রা

করো, যাত্রা করো।
কালো ছায়া ঘনিয়ে এলে
লোভের, আকাশ ভরে
ঘনিয়ে এলে
ভোরের, শমীশাখার ছায়া হতে
ভীরুতাভয় ছেড়ে
এসো, উঠে এসো, ধনুক
ধরো হাতে। সময় হল
গানের, সময় হল, ধানের
সময় হল॥

বহ্নিবাঙলা

এ কী দীপ্তমরুপ্রাণ, কী অগ্নিলেখ
আগ্নেয় ললাট তোমার, কী দ্বিপ্রহর
চোখে, জ্যোতির্ময় ক্রোধ
ফেনশীর্ষ সমুদ্রের, এ কী ক্রোধ হৃদয়ে তোমার,
হে বাঙলা !

আকাশে নির্জন পথ
আলোকের নদীর কিনারে। সেখানে
নীরব নিমের নিচে কেউ
ঘর বেঁধেছিল ; ভেবেছিল
জ্যোৎস্নার জোয়ারে এসে থাকবে
কখনো। সে ঘর ভেঙেছে কেন।
প্রেরণার মুগ্ধ পথে কেউ এসে
দিগন্তপ্রবাহ থেকে কথা তুলে নিয়ে
লোকালয়ে গেছে। কোন মেয়ে
নিশ্চিন্ত নির্ভর যদি তার
হৃদয়ে রাখে, ভেবেছিল, সেকথা শোনাবে
তাকে। সে মেয়ের সাথে দেখা
ক্ষুধার মিছিলে।

(এ কী হৃদয় তোমার, হে বাঙলা!)

মৃত্যুরোদে ভোর হলে চোখ বুজে
আচ্ছন্ন পাখির মত ডেকে উঠে কেউ
জেগেছিল প্রাণের পিপাসায়। তারপর ঘুরে ঘুরে দশদিক
দেখেছে সে, শুধু মৃত্যু
বেঁচে আছে ; মৃত্যু এসে হনন করেছে
প্রাণকে। চুপে চুপে তার মহোৎসব
এ ভীরু সন্ধ্যায়।

তখন ক্রোধের পতাকা হাতে
রক্তলাঞ্ছন, রুদ্র বৈশাখের দিকে
যাত্রা ; তখন দীপ্তমরুমন ; তখন
এ কী বহ্নি করেছ বপন হে বাঙলা,
হৃদয়ে আমার !

ভাসান

আমিও এলাম তোমাদের পাশে
আমিও নিয়েছি পতাকা উত্তাল নিঃশ্বাসে
আমিও অস্থির হয়েছি পথে পথে হেঁটে
অসংখ্য মৃত্যুর মুখ দেখে।

তোমরা যারা আকাশের মত দিগন্তে মেঘডম্বরু বাজালে,
যারা সমুদ্রের কল্লোল থেকে শঙ্খ নিয়েছ হাতে,
মাটির বিপুল স্নেহ থেকে স্নেহ নিয়েছ হৃদয়ে,
যারা আজ অভিমন্যুর দীপ্ত মুখখানিকে ঘিরে বসে আছো
কুচবিহারের এক কলকল্লোলিত পথে,
তোমরা আমার বেদনার অশ্রুমতীতে তার তরুণ দেহখানি ভাসিয়ে দাও।
আমি তাকে বহন করে নিয়ে যাব
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
দেশে দেশান্তরে ; ফাল্গুনে
উদ্ধত শিমুলশাখা ছিল যে গ্রামে।
আমি তাকে নিয়ে যাব যেখানে
মানুষ জীবনের জয়যাত্রায় বেরিয়েছে,
যেখানে তারা হঠাৎ ভেঙে পড়েছে বিদ্রোহের গানে,
প্রশান্ত ভোরের জন্য দিগন্তের কাছে অপেক্ষা করে আছে।

আমি তার সুকুমার দেহখানি বহন করে
সন্ধ্যার আকাশের কাছে নিয়ে যাব, বলব,
'তোমার ললাটের মত এর ললাটও রক্তে সুন্দর হয়েছে, দেখো।

আশীর্বাদ করো একে।'
নিয়ে যাব বৈশাখের মেঘমাশ্লিষ্ট ফেনচূড় সমুদ্রের কাছে,
বলব, 'তোমার দিকে দিকে যে ঝড়
উৎক্ষিপ্ত জটাজাল বিস্তার করেছে,
যে নাগিনীকন্যারা ফুঁসে উঠেছে তীরের কাছে কাছে
অন্ধকার বনপ্রান্তের সীমানায়, দেখো
এর সুন্দর ললাটেও সেই তীক্ষ্ণ তীব্র ক্রোধ।
আশীর্বাদ করো একে।'
নিয়ে যাব তার অশান্ত মায়ের কাছে,
বলব, 'ভয় ক'রো না, আমাদেব বেদনায়
তোমার অভিমন্যু প্রাণসঞ্জীবিত হবে।'
বলব, 'স্থির হও, চোখ তুলে দেখো
তোমার অভিমন্যু মৃত্যুকে হনন করে এলো।'

তারপর বহু পথ অতিক্রম করে, ডাকিনী রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে
তাকে নিয়ে যাব ভবিষ্যতের কাছে
যখন উচ্ছল শিশুর কণ্ঠে তোমাদের ঘর ভরে উঠেছে॥

চীন ঃ নভেম্বর '৪৮

মৃত্যু পায়ে পায়ে, পাথর পাহাড়। মাঝে মাঝে উষ্ণশ্বাস
হাওয়ার, আকাশ বিদ্যুৎবিদ্ধ, প্রাচীন প্রাকার
মহামৌন, লেন দেন হাতে হাতে চুপে চুপে
জীবনের, প্রান্তরে কঙ্করে পথে, গ্রামে গ্রামান্তরে
সতর্ক সঞ্চরণ ছায়ার। আদিগন্ত পাণ্ডুর মাঠের
ধূলো-ওড়া পথ ভেঙে, নিঃসীম সীমায় গিয়ে
আরো এক মাঠ, ধূ ধূ, দুস্তর।

বাতাসে জলের স্বর। কল্লোল ঢেউয়ের। প্রত্যন্ত উত্তর থেকে
ঘাস, মাটি, সর্পিল সহস্র শিকড়,
জরামৃত্যু, পিঙ্গল ভয়ের চোখ, নির্বাক
বিমূঢ় মন, ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে কী ভাস্বর স্রোতে
নদী এল নদী! উচ্ছ্বৃত জলের বিন্দু
ছড়াল দু'পাশে। প্রসন্ন মেঘের ভিড়ে
স্নিগ্ধ শ্যামতট ; অসংখ্য মানুষ নারী শিশু
নগর শহর থেকে, ছায়াসিক্ত গ্রাম থেকে শীর্ণ পথে পথে
এল, কলকণ্ঠ বলাকার মত। আকাশ আসন্ন হ'ল
দূরান্তে, দিগন্তে জলের। মাটির অন্তর চিরে
এ স্রোত কতদূর কতদূর যাবে॥

বৈশাখী

নিদারুণ অস্ত্র হেনে কেন এ পিপাসায়
বিদ্ধ করেছ আমাকে, হে বৈশাখ,
হে জীবন। আমার এ কণ্ঠে
পিপাসার শেষ নেই। ক্ষুধার জিহ্বার মত
এ মাটি লাল, চৈত্রের চোখের মত
এ প্রাণ দগ্ধ, পলাশপত্রের মত এ জীবন
কেবল আগুন জ্বেলে রাখে!

কতদিন নিঃশব্দ ভোরের মত
গ্রামের প্রান্তে রৌদ্র বিছিয়ে দিলাম,
কণ্ঠ এনে দিলাম পাখির, কতদিন
তারার আলোক হাতে
রাতের মুখ দেখলাম, তবু তো রাত
কালো ঘুম থেকে জাগল না।
কত যুগ কেটে গেল, তবু তো গ্রাম
রৌদ্রের ডাকে জাগল না।

কতদিন মানুষের ঘরে ঘরে
ঘুরলাম, কত বসন্তে বৈশাখে তাদের
বিশীর্ণ হৃদয়ের কাছে গেলাম ; সে হৃদয়
দুঃখের লাঞ্ছনায় বিকৃত, সে মুখ

বৈশাখী

নিহত শত্রুর মত বীভৎস।
কত যুগ কেটে গেল, তারা আজো
রক্তের মত সুন্দর হ'ল না।

আমি কতদিন আমার
হৃদয়ের ঘরে আলো জ্বাললাম।
দেখলাম, আমারই মৃতদেহ
আমারই পাশে শুয়ে আছে।
কত যুগ কেটে গেল, আজো তাকে
স্বপ্ন দিয়ে জীবনের মধ্যে
আহ্বান করতে পারলাম না।

তবু কখন কোন ভোরে তুমি সূর্যনাভ পদ্মের
অস্ফুট কোরক নিয়ে এলে
তোমার ব্যথার যৌবন থেকে ছিঁড়ে ;
আকাশের পাত্র ভরে রক্তিম দিনান্তের স্বাদ
দিগন্তে উদ্ভিন্ন করে দিলে। কখন তুমি মেঘের
অন্ধকার আহত আকাশকে
বিদ্যুতের আলোক জ্বেলে দেখালে।

আরো কত যুগ কেটে যাবে
আমার পিপাসার শেষ হতে,
কত যুগ কেটে গেলে মানুষ
বেদনায় সুন্দর হয়ে উঠবে, আমি স্পর্শ করব

বৈশাখী

আমার মৃতদেহকে, ঠোঁটের কাছে ঠোঁট রেখে
তার মুখে কথা দেব, আমার নিঃশ্বাস থেকে
নিঃশ্বাস দেব তাকে।

তোমার উত্তাল যৌবন থেকে
প্রাণের শ্লোক উচ্চারণ করব ॥

গ্রহণ

প্রাণের বিদ্যুৎ দিয়ে তোমাকে ছুঁলাম।
মনের অশান্তি দিয়ে তোমাকে নিলাম।
সঞ্জীবিত সন্নিহিত হও।

পাখির ডাকের মত এই ডাকলাম।
স্মৃতি ও স্বপ্নের মত ভালোবাসলাম।
উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত হও।

সমুদ্রফেনার মত মুখর হলাম।
অনুজ্জ্বল অন্ধকারে হাত মেলালাম।
সমাগত সমানত হও।

লোভের মৃত্যুর এক ছবি দেখলাম।
সূর্য থেকে প্রাণ নিয়ে তোমাকে ছুঁলাম।
উজ্জীবিত উজ্জীহান হও।

মেয়ে, মনের অশান্তি নিয়ে তোমাকে নিলাম॥

বর্ষার কবিতা

কে তুমি আকাশে মঞ্জীর ভরে
মেঘমন্দ্রে, ঘূর্ণির তালে নৃত্যের মত বিদ্যুৎ করে
নেমেছ ; কে তুমি প্রখর মূক অম্বর
ঝংকার তোল ঝঞ্ঝার,
অরণ্যে কি যে মর্মর, ধনুকের হাতে টংকার ॥

অভিমন্যু

ভোর। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে সূর্য উঠছে। সেই আলোকলগ্নে বহু মানুষের ছিন্নদেহে কুরুক্ষেত্র সমাকীর্ণ। দূরে কৌরব শিবিরে পতাকা উড়ছে। প্রহরীর বর্শাফলকে ঝকমক করছে আলোক। কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তর নিস্তব্ধ, কোথাও কোন কর্মলক্ষণ নেই। সেই নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আহতের নিদারুণ চিৎকারে।

পাণ্ডব শিবিরে সংবাদ এসেছে, কৌরব পক্ষ আজকের যুদ্ধে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করবে। পাণ্ডব শিবিরে তাই ব্যূহ ভেদের প্রস্তুতি চলেছে। ব্যূহ ভেদ করবে অভিমন্যু।

তারই কল্যাণকামনায় উত্তরা তার অপূর্ব নৃত্যে সূর্যের উপাসনা করছে, জীবনের উন্মোথিত অশান্তির মধ্যে জাগ্রত করে তুলছে তার আলোক।

অভিমন্যু। শ্রান্ত তুমি, যেন ত্ব'হাতে
তৃষ্ণার মুদ্রা তুলে ধরে
মৃতমরুপথ, বৈশাখের
করতপ্ত দিগন্ত থেকে এলে।
ক্লান্ত তুমি, নীরব বিশ্রামে থাকো।

উত্তরা। যৌবনের শ্রান্তি নেই, শ্রান্তি নেই
আমার নৃত্যের। এ নৃত্য
যৌবন আমার, তার ঢেউ
ছলোছলো হৃদয়ের প্রান্তে এসে লাগে,
স্বর্ণাভ মুকুট সন্ধ্যার যেমন
দিগন্তের প্রান্তে লেগে শতখণ্ড হয়ে গেলে
অসহ্য আলোক ছড়ায়। আমি সন্ধ্যা
দিগন্তে তোমার।

অভিমন্যু। তুমি তো আমার
জীবনের মর্ম্মমূলে আছো
নদীর মতন। ভোর হলে
মৃদুস্বর তুলে
আমাকে কেবল ডাকো, ডেকে নিয়ে যেতে চাও
যেখানে গাছের পাতা রৌদ্রে ভরে গেছে ;
মধ্যাহ্নে মন্থর তুমি, নীরব। রাত্রে দেখি,
অস্থির তরঙ্গতনু উদ্বেল তোমার।
উত্তরা। শোন শঙ্খ বাজে। যুদ্ধের আহ্বান শোন
দিকে দিগন্তরে। কারা খর কোলাহলে
ঝলকিত অস্ত্র নিয়ে আসে। উত্তাল হয়েছে
জয়ভেরী, চৈত্রের মেঘের মত
চতুরঙ্গ সেনা সমুদ্যত।
অভিমন্যু। আমারও এসেছে আহ্বান। বহুদিন
আশা ছিল মনে, বহুদিন
একাগ্র ইচ্ছায় ভেবেছি, আমিও সৈনিক হবো,
আমিও পতাকা নিয়ে রথের চূড়ায়
রুক্ষ ধূলি, তপ্ত মৃত্যুর
সীমান্তে যাবো।
উত্তরা। এতো হিংসা কেন! জীবনের
পথ হেঁটে যেতে তুমিও
নির্ভর করেছ অস্ত্রে।
মানুষের রক্তের কি
কোন মূল্য নেই।
অভিমন্যু। অসীম অনন্ত মূল্য আছে, তবু —

উত্তরা। তবু দ্বিধা নিয়ে আছো। তবু
সন্দেহের সেতু পার হয়ে আসো নাই।
আজ যারা যুদ্ধে এসে
হৃদয়ের ছিন্নডালি রক্তে ভরে দেবে,
উদ্যত বর্শার মুখে আপনার
মৃত্যু দেখে যাবে, অন্ধকার মৃতচক্ষে
আকাশ পৃথিবী প্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে, তারাও
কারো বুকে কান্না তুলে আসে,
দীর্ঘশ্বাস রেখে আসে অন্ধকার ঘরে।

অভিমন্যু। জানি সব। জানি তারা
অসংখ্য অস্ফুট দাগ বহু কামনার
মূঢ়বালুপ্রান্তরে সযত্নে সাজিয়ে রাখে,
অসংখ্য ইচ্ছার শুধু
প্রান্ত ছুঁয়ে আসে।

উত্তরা। তবু তো তাদের অস্ত্র হানো,
খণ্ড খণ্ড করে দাও
অতৃপ্ত ইচ্ছার মঞ্জরীকে।

অভিমন্যু। যদি তারা মিথ্যার পতাকা নিয়ে আসে, যদি
অসত্যের জয়ধ্বনি করে, পার্শ্বচর হয়
অত্যাচারী দুর্যোধনের, রক্তে তার
মূল্য দিতে হবে।

উত্তরা। এ কী কঠিন মূল্য, এ কী নিদারুণ!

অভিমন্যু। যে নদী গ্রামের কাছে ঘরের শিয়রে থেকে
কথা কয় মৃদুকণ্ঠে, সে যদি

আষাঢ়ের ষড়যন্ত্রে স্ফীত হয়ে ওঠে, যদি বন্যার
উদ্ধত চূড়া বেঁধে আসে,
অন্ধকার ডাক তুলে নগরশহরগ্রাম
হঠাৎ ভাসাতে চায়, কপালে তিলক এঁকে
কাপালিক খড়্গ তুলে আসে, তবে
লৌহবাঁধ বেঁধে দিতে হবে
সহস্র হাতের মুষ্টি তুলে, যেন তার বুক
সে লৌহ কপাটে লেগে চূর্ণ হয়ে যায়,
যেন তার মুখে রক্ত জেগে ওঠে।

উত্তরা। হিংসা কি কোনদিন শান্তিগামী হবে, কোনদিন
ঘরে ঘরে গান হয়ে উঠে পৃথিবীর
বসন্তহৃদয় এনে দেবে,
দিনকে সাজিয়ে দেবে আশ্বিনের
মেঘের অলংকারে, শিশুর উৎসবে ?

অভিমন্যু। হিংসা নয়, আমাদের হাতে আজ
হিংসার উত্তর। কুটিল মৃত্যুর ফাঁদ
পেতে দেবে বলে দ্রোণ সেনাপতি
কৌরব পক্ষের। তাই আজ আয়োজন
নিদারুণ ব্যূহ রচনার। তাই আজ কাকচক্র
ওপরে আকাশে।

উত্তরা। দ্রোণ সেনাপতি! সেই শুভ্রকেশ দীর্ঘদেহ
সৌম্যসুপুরুষ! কী গুণে দুর্যোধন
বিমুগ্ধ করেছে তাঁকে!

অভিমন্যু। যে গুণ মুদ্রার আছে।

উত্তরা। কী গুণের অধিকারে তুমি তাঁর

অস্ত্র কেড়ে নেবে, তাঁর রথ
তোমাকে বরণ করে নিয়ে
শত্রু হবে কৌরবের। সে কি
শ্রদ্ধায়!

অভিমন্যু। শ্রদ্ধা! অস্ত্র যার ব্যবসায়, নিষ্ঠা যার
রূপসী মুদ্রায়, তার কাছে শ্রদ্ধা কোনদিন
মূল্যবান হবে! তাই অস্ত্র দিয়ে তার
অস্ত্র কেড়ে নেব, শক্তি দিয়ে তার
অহংকার জয় করে নেব।

উত্তরা। তাই হোক, তোমার শক্তিতে তোমার
পরিচয় হোক।

॥ দূতের প্রবেশ ॥

দূত। প্রস্তুত হয়েছে রথ। সারথী সুমন্ত্র
প্রস্তুত।

অভিমন্যু। আর দেরি নয়, যাব অস্ত্রাগারে, সুকন্যা।

॥ দূতের প্রস্থান ॥

উত্তরা। এখনি যাবে! যুদ্ধের প্রহর কি
আসন্ন হয়েছে, এখনি কি
চলে যেতে হবে? আর কি
সময় নেই? আরো কিছুক্ষণ
থাকো কাছে, কথা কও
শ্রাবণের মত। তারপর
তোমার কঠিন হাতে অস্ত্র তুলে দেব।

অভিমন্যু। সবুজ বৃন্তের মত আমি তো তোমাকে
করেছি ধারণ, তোমার স্তবকে
রৌদ্র এলে আমার সর্বাঙ্গে
তার আভা নামে, আমার গভীর থেকে
তোমার সৌরভ ওঠে জেগে। তবু আজ জীবনের
ব্যথার হৃদয় থেকে
ডাক আসে। সে ডাকে
তোমারও কণ্ঠ আছে।

উত্তরা। তবে আমাকে সারথী করো
তোমার রথের, তোমার
জয়ের সারথী করো।

অভিমন্যু। সে যে যুদ্ধক্ষেত্র! বীভৎস মৃত্যুর
মাঝে যাবে!

উত্তরা। যদি কোন শিথিল সময়ে
হাত থেকে তীর খসে পড়ে,
আমি তুলে দেব ধনুকে তোমার।
যদি কোন অস্ত্র আসে
তোমার বুকের কাছে, আমার
হৃদয়ের পথ পার হয়ে যাবে।

॥ দূতের প্রবেশ ॥

দূত। পাণ্ডবসেনানী
আপনার প্রতীক্ষায় আছে।

অভিমন্যু। বলো তাদের, প্রস্তুত হয়েছি আমি।

॥ দূতের প্রস্থান ॥

তুমি থাকো ঘরে
অকুণ্ঠ কল্যাণের মত ; তোমার চোখে
উজ্জ্বল আশ্বাস আছে দেখে
শান্ত হবেন মাতা সুভদ্রা, পাণ্ডব কন্যারা
আশ্রয় পাবে খুঁজে।

উত্তরা। তাই হবে। আমি থাকি শান্তমনে
পাণ্ডব শিবিরে, তুমি কুরুক্ষেত্রে
প্রচণ্ড যুদ্ধের ঝংকারে যাও। তবু তার আগে
তোমাকে সাজাব আমি
আলোকসূর্যের মত। যেন তোমার আঘাতে
মৃত্যু নামে ; সে আঘাতে
যেন প্রাণ বসন্তেবৈশাখেবর্সায়
উদ্বেল হয়ে ওঠে ; ঋতুর উচ্ছ্বাসের মত
তোমার আঘাতে যেন
প্রাণের অঞ্জলি ভরে ওঠে
বার বার।

অভিমন্যু। তবে অস্ত্র দাও, তীর দাও তূণীরে আমার,
তৃষ্ণায় ভরিয়ে দাও উজ্জ্বল খড়্গের বুক, ললাটে
রক্তিম উষ্ণীষ দাও, স্কন্ধে দাও
প্রচণ্ড ধনুক, তরুণ অশোকশাখা আমার
রথের শিখরে দাও।

উত্তরা। আর ভোরের শিশির দেব তোমার
আগ্নেয় অস্ত্রের মুখে, যেন
তার দেহ থেকে হিংসা ঝরে যায়।
তোমাকে তূণীর দেব অনন্যময়ূরকণ্ঠী।

॥ উত্তরা অভিমন্যুকে অস্ত্র দিয়ে সাজাতে লাগল ॥

অভিমন্যু। আর দিও প্রতীক্ষা তোমার
রাত্রিশেষ দিগন্তের মত।

উত্তরা। তুমি যাবে কর্তব্যের কণ্ঠ শুনে,
যখন জীবনের হাতে
সংগ্রামের শঙ্খ বাজে।
আমি ঘরে প্রদীপের মত
আগুনের শিখা বুকে করে
বেদনার দিকে যাব। সে বেদনা উঠে এসে
বিচ্ছেদের ছিন্নপ্রাণ থেকে
সাথী হবে আমার নৃত্যের। তুমি ফিরে এলে
আমার দিগন্তে তার কল্লোল
উৎসারিত হবে।

সেনাপতি দ্রোণের শিবির। দ্রোণ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করছেন। শিবিরের বাইরে তাকালে চোখে পড়ে সৈন্যবাহিনীর বহুদূর বিস্তৃত শ্রেণীবিন্যাস। পদাতি, রথী, অশ্বারোহী এবং গজারোহীরা প্রত্যেকেই অস্ত্র উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি শ্রেণীর সম্মুখে এক একটি বিশাল পতাকা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে উড়ছে। যুদ্ধের সময় আসন্ন। মাঝে মাঝে ভেরীর গুরু গুরু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

দ্রোণ নিঃসঙ্গ, অস্ত্রসজ্জা করছেন। ললাটে দীর্ঘ রেখা, মুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

॥ প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা
দর্শনপ্রার্থী।

দ্রোণ। বলো তাঁকে, আমি তাঁর
প্রতীক্ষায় আছি।

। প্রতিহারীর প্রস্থান ॥

॥ দীর্ঘতমার প্রবেশ

দ্রোণ (প্রণাম করে)
আশীর্বাদ প্রার্থনা আমার,
যেন জয়ী হতে পারি।

দীর্ঘতমা তুমি দ্রোণ, তুমি মহানেতা
কৌরবসেনার। তুমি চাও আশীর্বাদ
এ অন্ধ ঋষির। আশীর্বাদ নেই কোন,

সে ভাষা হারিয়ে গেছে কখন
কণ্ঠ থেকে। আমি আজ
প্রার্থী তোমাদের কাছে।

দ্রোণ। আমি আছি আজ্ঞাবহ। প্রর্থনা পূরণ করি
আমার তো এতো গৌরব নাই।

দীর্ঘতমা। এক বিন্দু আলোকের শিখা দাও
আমার উন্মুখ প্রদীপহাতে।
এ কী অন্ধকার, অন্ধকার মৃত্যুর রাজ্যে
এলাম! এখানে হত্যা
অধীর লালসায়
রাত জেগে আছে, মিথ্যা সুমধুর
জীবনের ভাষ্য দেয়, শয়তানের ভীরু হাত
সঙ্গোপনে দিনান্তের কাছে
শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে। দু'চোখে অন্ধকার নিয়ে
সে পথ হেঁটে এলাম, একটু আলোর আশায়
পাহাড় প্রান্তর, রাজ্য থেকে রাজধানী
পার হয়ে তোমার শিবিরে এলাম।
কোথাও আলোক নেই, প্রদীপ্ত মশাল হাতে কেউ
নিভু নিভু আকাশের কাছে
নেই, সোনার শরৎ এলে
কোথাও ভোরের কণ্ঠ
বনশীর গ্রামান্তের তীর থেকে
জেগে ওঠে না তো। একটু আলোক দাও
যে আলোক হাতে নিয়ে মানুষ
জীবনের নদী খুঁজে পাবে।

দ্রোণ। রাজা দুর্যোধন আলোকদাতা
এ রাজ্যে, প্রাণদাতা মানুষের।
দুর্যোধন জয়ী হলে তাঁর রাজ্যে
আপনারও স্থান হবে
সগৌরবে।

দীর্ঘতমা। দুর্যোধন জয়ী হলে
জীবন কি কোনদিন
আকাশের মত যৌবন
ফিরে পাবে।

দ্রোণ। দুর্যোধন জয়ী হলে জয়ী হবে
অগণ্য মানুষ, অসংখ্য ক্ষুধার ঘরে
অন্ন সুপ্রচুর দেখা দেবে, জীবন
মধুর হবে, অজেয় অম্লান হবে।

দীর্ঘতমা। তাই দুর্যোধন উদ্গাতা
এ মারণযজ্ঞের, তাই দুর্যোধন
সারথী ধ্বংসের!

দ্রোণ। এ মরণ মৃত্যুর, এ ধ্বংসের শেষে
আর ধ্বংস নেই।

দীর্ঘতমা। শুধু শান্তি আছে, যে শান্তির রাতে
ঘর ভাঙে সহস্রের, সুখশান্তিপ্রেম
শ্মশানে চিতায় জ্বলে, মাতা শুধু জেগে থাকে
হৃদয়ের কান্নার পাশে, বৃদ্ধ পিতা
উৎকণ্ঠ আশায় দিন গেলে
অন্ধকার সন্ধ্যার দিকে
ফেরে ধীরে ধীরে। পথে পথে

রাত্রি বাড়ে। প্রিয়তম পুত্র তার
সুকুমার স্নেহের সন্তান শৃগালনখরে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়
এই বধ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে। না, না, তোমাদের হাতে
কল্যাণের প্রশান্ত পতাকা নেই। তুমি মহারথী
মিথ্যাচারী, তুমি কুঠার
হিংস্র দুর্যোধনের।

॥ দীর্ঘতমার প্রস্থান ॥

দ্রোণ আবার অস্ত্রসজ্জায় মন দিলেন। এখনি যেতে হবে, আর সময় নেই। ক্ষিপ্রহাতে একখানা তীক্ষ্ণ তলোয়ার তুলে নিলেন।

দ্রোণ। দুর্যোধন, এই অস্ত্র হাতে দিয়ে আমাকে
নায়ক করেছ তোমার, সম্মান দিয়েছ
শ্রদ্ধায়, আমিও কি পৃথিবীকে তার
বিষাক্ত বিশ্বাস দিয়ে যাব!

যুদ্ধক্ষেত্র। অভিমন্যুর শরবর্ষণে কুরুসৈন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। বহু শত্রুসৈন্য ইতিমধ্যেই হতাহত হয়েছে। দুর্যোধনের এক পুত্র নিহত হয়েছে। অপূর্ব আনন্দে অভিমন্যু ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠছে। তীব্রতর হয়ে উঠছে তার আক্রমণ।

সুমন্ত। তুমি জয়ী আজ। তুমি
দীর্ণবক্ষ পৃথিবীর মানুষের
গান, তুমি ঘরে ঘরে
অগ্নিসম্ভব প্রাণ
এনে দিলে।
অভিমন্যু। আমি যে কামনায়
রক্তকরবী : আমি মানুষের আশা থেকে
বজ্র নিয়েছি হাতে, মুমূর্ষুর ব্যাকুল দু'হাতে
দেখেছি শূন্যের ভার, বেদনার গান থেকে
বিদ্যুৎ উঠেছে জেগে ' তাই পরাজিত
দুর্যোধন, কর্ণ পরাজিত।
সুমন্ত। দিগন্তে দিনের শেষ হ'ল।
পঙ্গপাল শকুনিরা এলো
ছায়া নিয়ে ক্ষুধার। রক্ত নেবে তুলে,
মাংস তুলে নেবে কারো
প্রিয়মুখ থেকে। যে ঠোঁটে তখনো কথার
মৃদুস্বাদ লেগে আছে তাকে
ছিঁড়ে দেবে নখের আঘাতে। এ দগ্ধদিন .
শেষ করে দাও, শেষ করে দাও
এ মৃত্যুর মরুডম্বরু।

দ্রোণ ক্লান্ত হয়ে রথের ওপর বসে আছেন। যুদ্ধের কোলাহল ছাপিয়ে ক্রমশ যেন বহুলোকের হাহাকার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্রোণ মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন আবার স্থির হয়ে বসছেন।

॥ দূতের প্রবেশ ॥

দ্রোণ। কেন ঊর্ধ্বশ্বাস, ভীতচোখ
তোমার ; কী সংবাদ এনেছ তুমি শঙ্কার
ছায়া দিয়ে ঘিরে!

দূত। সংবাদ নিদারুণ। দীপ্তধনু কর্ণ পরাজিত!

দ্রোণ। কর্ণ পরাজিত!

দূত। অভিমন্যু অজস্র অলক্ষ্য শরে
বেষ্টন করেছে তাঁকে।
শিবিরে মূর্ছিত মহাবীর।
মহাপুণ্য দুর্যোধন শরণার্থী
আপনার, আদেশ প্রার্থনা করেন।

দ্রোণ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করে)
আদেশ! বলো তাকে
অদৃশ্য পশ্চাৎ থেকে
কঠিন আঘাত হেনে অস্ত্র কেড়ে নিতে
অভিমন্যুর, সারথীকে তীরবিদ্ধ করে
রথচক্র ভেঙে দিতে তার। বলো তাকে
আমার আদেশ এই।

দূত। জানি, এ আদেশ আশীর্বাদ হবে।

॥ দূতের প্রস্থান ॥

দ্রোণ। (অর্ধস্ফুট কণ্ঠে)
আশীর্বাদ হবে! এ যে আদেশ মৃত্যুর,
মন্ত্রণা শিশুহত্যার! আমি দ্রোণ,
মুগ্ধ গুরু পাণ্ডবকুমার
অর্জুনের। আজ আমি তার
পুত্রের হত্যায়
উদ্যত, আজ আমি লালসার গহ্বর থেকে
অভিশাপ উচ্চারণ করি!

দ্রোণ চুপ করলেন। একটু দূরেই সহস্র সহস্র মানুষ ক্ষিপ্তের মত যুদ্ধ করছে। মনে হচ্ছে, চিৎকারে আকাশ ফেটে যাবে। পশু এবং মানুষ একই সঙ্গে উন্মত্ত কোলাহল তুলেছে।

দ্রোণ নীরব। চিন্তান্বিত। যেন গভীর কোন প্রশ্নের আঘাত লেগেছে মনে, বিশ্বাসের ভিত্তি বিচলিত হয়েছে, চেতনায় দ্বন্দ্বের আভাস দেখা দিয়েছে। কিছুক্ষণ কেটে গেল, নিঃশব্দে। তেমনি বসে রইলেন দ্রোণ, যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে, নীরবে, চতুর্দিকে অস্ত্রের ভয়ংকর গর্জনের মধ্যে। তারপর এক সময় হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

দ্রোণ। বড় ক্লান্ত লাগে। মনে হয়
সব শক্তি গেছে, নিজেকে
নিজেরই হাতের মিথ্যা দিয়ে ঢেকে
রৌপ্যচক্রে মুখ দেখি
জীবনের। কোথাও সান্ত্বনা নেই, কোথাও
নির্ভর নেই আর। গভীর সন্ধ্যার ঘাটে
নিথর জলের নিচে নোঙরের
কঠিন আঙুল নেই। পথ নেই,

অভিমন্যু

মনে হয়, পথ নেই আর।

কে, দুর্যোধন? যে দিকে পথের রেখা দেখি,
সেদিকেই বীভৎস লোভের জিহ্বা
তোমার, সেদিকেই তুমি আছ
হিংস্র চোখে, রক্তের ক্ষুধায়।

॥ দীর্ঘতমার প্রবেশ ॥

দীর্ঘতমা। পথ আছে, পথ আছে। শোন কার ধনুকে
টংকার উঠেছে বেজে।
চেয়ে দেখো, যেন কার বুকে
রাত্রি গেছে কেটে, বেদনার
জয় হ'ল কার।

দ্রোণ। টংকার তুলেছে অভিমন্যু, শিশু দেবদারু
ঝড়কে পেয়েছে শাখায়।

দ্রোণের আদেশে অভিমন্যুকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করেছে কৌরব সৈন্য। সারথী সুমন্ত্র নিহত হয়েছে, রথচক্র ভেঙে পড়েছে। রথ অচল দেখে অভিমন্যু মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। হাতে অস্ত্র নেই; সপ্তরথী বেষ্টন করেছে তাকে। অভিমন্যু তবুও অদম্য, রথচক্র তুলে নিয়েছে হাতে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসছে চারদিক থেকে।

অভিমন্যু। সপ্তরথী সপ্তদিকে। ধনুক কেটেছে কর্ণ—
পশ্চাতের গুপ্তচর। রথ গেছে। সারথী সুমন্ত্র
নেই। তবু দুর্যোধন, আমার এ প্রাণ দুর্জয়, তবু
রথচক্র হাতে আছে; উত্তরা কখন
বিকেলের আলো হাতে
হৃদয়ের ঘর সাজিয়েছে!

(দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে অভিমন্যু রথচক্র উদ্যত করল—)

এই নাও মৃত্যু তোমার, আমার
কঠিন ক্রোধ, অভিশাপ সহস্রের। এ আঘাত
যেন বজ্র হয়, অগণ্য প্রাণের
উন্মত্ত চিৎকারে যেন
বিদ্ধ করে দেয় তোমাকে। ধ্বংস হোক
ধ্বংস হোক তোমার।

দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে বিদ্যুৎবেগে চক্র ছুঁড়ে দিল। হঠাৎ পেছন থেকে দুর্যোধনের এক পুত্র প্রচণ্ড আঘাত করল অভিমন্যুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অভিমন্যু। আবার নিদারুণ আঘাত হানল অভিমন্যুর তরুণ সুন্দর মুখের ওপর।

দ্রোণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তীব্র বেদনায় চিৎকার করে উঠলেন—

দ্রোণ। এ কী! এ কী! এ যে হত্যা!
এ যে হত্যা!

অস্থির আক্রোশে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেলেন দুর্যোধনের পুত্রের দিকে।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগেই সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। যুদ্ধ থেমে গেছে সে দিনের মত। সৈন্যরা শিবিরে ফিরে আসছে। যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল থেমে আসছে, ক্রমশ মৃদুতর হয়ে আসছে। নীরবতায় ভরে উঠছে চারদিক। কেবল আহতের চিৎকার ফেটে পড়ছে থেকে থেকে। কান্না শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

উত্তরা অধীর হয়ে উঠেছে। অভিমন্যু ফিরে আসবে এখনি। তার জন্য জয়মাল্য গেঁথে রেখেছে, ধূপের সৌরভ ছড়িয়েছে ঘরে, স্তম্ভে স্তম্ভে ধানের আনত মঞ্জরী বেঁধে দিয়েছে।

নূপুর বেঁধে নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে উত্তরা। সখীরা তাকে সজ্জায় বিচিত্রসুন্দর করে তুলেছে।

উত্তরা। এ কী অপরূপ সজ্জা আমার! এ কী দীপ্তি
দিয়েছ দেহে। নূপুরে সমুদ্রের
স্বর। মেঘকান্তি শাড়ি
যেন স্বপ্নের মত
বেষ্টন করেছে পাকে পাকে।
নৃত্যের আবেগে কাঁপে বুক।
হৃদয় ভেঙে কার
পদধ্বনি আসে॥